সন্ন্যাসী-ফকির আন্দোলন : প্রেক্ষিত বাংলা উপন্যাস

মৃণালচন্দ্র হালদার

সন্ন্যাসী ও ফকির আন্দোলন কী ও কেন ?

অষ্টাদশ শতকের সত্তর থেকে নব্বই দশকের মধ্যে সন্ন্যাসী ও ফকির সম্প্রদায় দেশীয় প্রশাসক ও ইংরেজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ ও তা থেকে যে বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা করে তা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে সন্ন্যাসী-ফকির-আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত। এই আন্দোলনের মুখ্য ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভবানী পাঠক, মজনু শাহ ফকির, দেবী চৌধুরানি প্রমুখ। এঁরা একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রত্যেকের একই উদ্দেশ্য। ইংরেজ ও দেশীয় শাসকদের অত্যাচার ও কুশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও তাদের প্রতিহত করে দেশকে সুস্থ করা অত্যাচার মুক্ত করা।

ভবানী পাঠক বাঙালি নন, ছিলেন ভোজপুরী। বিহারের গভীর জঙ্গল ছিল তাঁর আস্তানা। আর মজনু শাহ ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী। অপরদিকে, দেবী চৌধুরানি ছিলেন আপাদ-মস্তক বাঙালি ঘরের বধূ। এবং রংপুরের ছোটখাটো জমিদার।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানির অধীনে ব্রিটিশ শাসকরা শুধুমাত্র বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব নিয়ে তুষ্ট ও শান্ত হয়ে বসে রইল, তা কিন্তু নয়। দেশের পতিত জমি ও জঙ্গল মহলের দিকেও তারা নজর দিতে লাগল। এ সময় তারা দুটি Policy গ্রহণ করল এবং তা জোর করে এদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দিল।

এক। Land Sizing Policy

দুই। Forest Policy

এক। Land Sizing Policy :

যে কোনো অজুহাতে দেশের জমি-জিরেত দখল করাই হল এই Policy-র মূল উদ্দেশ্য। সে ফসলি, পতিত কিংবা আগাছা পূর্ণ পোড়ো জমি, যাই হোক না কেন, এবং এর জন্য যাবতীয় ফিকির বাৎলালো তারা।

বলাবাহুল্য, বাংলার তৎকালীন জমিদারদের সম্পদ অপেক্ষা প্রতাপ ছিল অনেক বেশি। আর সে প্রতাপের উত্তাপ জিইয়ে রাখার জন্য তারা পাইক-সরদার-

নায়েক পুশতেন যারা কিনা পেশি শক্তিতে ছিল বলীয়ান। জমিদারি Protection-এর জন্য এ ধরনের লেঠেল-বরকন্দাজ বাহিনীর প্রয়োজনও ছিল। জমিদার বাবুরাও এদের তুষ্ট করার জন্য বা অধীনে রাখার জন্য কিছু কিছু নিষ্কর জমি এদের প্রদান করতেন। এ ধরনের জমিকে বলা হতো 'পাইকান' জমি। কিন্তু দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানির শাসকরা এই ধরনের জমি কেড়ে নিলেন। ফলে ঐ সরদার-পাইক-বরকন্দাজরা অনেকেই ভূমিহীন হয়ে পড়ল। এর ফল স্বরূপ তারা ধীরে ধীরে ইংরেজদের উপর বিরক্ত ও বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এই পথ ধরেই ১৭৬৭ সালে চুয়াড় বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৭৯৯ সালে এই বিদ্রোহের আসল রূপ ফুটে ওঠে। ধীরে ধীরে এই বিদ্রোহ মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। মেদিনীপুরের রানি শিরোমণি এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।

দুই। Forest Policy :

এই Policy-র উদ্দেশ্য হল দেশের যে বিশাল জঙ্গলমহল, সেই (সূর্য হারা) অরণ্যের উপর অর্থসন্ধানী নজর এবং যেনতেন প্রকারেণ তা নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করাই হল ব্রিটিশদের প্রধান উদ্দেশ্য। যা ভাবা সেই মতো নির্মম কাটাছেঁড়া শুরু করলও তারা। একবার ভাবলো না তাদের কথা, যারা দীর্ঘদিন এই জঙ্গলমহল আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে। সেই আদিবাসী আরণ্যক মানুষজনের কথা? একদল যাদের সবকিছু ছিল— ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে নিজস্ব সংস্কৃতি সব। এখন তাদের সব হারাতে হলো। সব হারিয়ে যেদিন ওরা এই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল, হাতে তুলে নিয়েছিল কাঁড়-কুঠার-টাঙ্গি শিকারের যাবতীয় আইয়ুধগুলো। শিকারই ছিল তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন সেদিন, আজ তাও চলে যেতে বসেছে, সেটুকুও তাদের হারাতে হবে! এই সব হারানোর ভাবনা থেকে তারা সংঘবদ্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠল। শান্ত চির নির্জন অরণ্যভূমি কেঁপে উঠল, এই আদিবাসী-বুনো বর্বর মানুষজনের গর্জনে। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। সালটা ছিল ১৭৬৭-'৯৯ মধ্যে।

সন্ন্যাসী ও ফকির আন্দোলনের সময়কাল ও ঐতিহাসিক পরম্পরা :

সন্ন্যাসী ও ফকির আন্দোলনের সময়কাল ছিল প্রায় সমসাময়িক। যে ঐতিহাসিক চুয়াড় বিদ্রোহ ঘটেছিল ১৭৬৭-'৯৯ মধ্যে, সেই সময়ের মধ্যেই ঘটেছিল সন্ন্যাসী ও ফকির আন্দোলন। সুতরাং একটির সঙ্গে অন্যটির যোগ এবং চরিত্রগত মিল থাকাটা স্বাভাবিক।

এক। উভয় সম্প্রদায়ই ছিল ব্রিটিশদের দ্বারা শোষিত।

দুই। এরা ছিন্নমূল হয়েছিল একই পথ ধরে।

তিন। বিদ্রোহের দুর্গ বা ঘাটি ছিল জঙ্গল (উভয়ের)।

চার। দুই সম্প্রদায় কোম্পানির অর্থ ও সম্পদ লুঠ করত।

পাঁচ। লুঠের অর্থ ও সম্পদ গরীবদের মধ্যে তারা বিতরণ করত।

এই সূত্র ধরে দুই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতাদের মধ্যে যোগসূত্র থাকা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতএব, ভবানী পাঠক, মজনু শাহ কিংবা দেবী চৌধুরানির সঙ্গে চুয়াড় বিদ্রোহের নেত্রী রানি শিরোমণি ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী চুনীলাল খানের যোগ ছিল। রানি শিরোমণি ছিলেন কর্ণগড়ের (মেদিনীপুর) রানি। আর চুনীলাল খান ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী নাড়াজোলের জমিদার।

সন্ন্যাসী-ফকির আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দুটি উপন্যাস—

সন্ন্যাসী ও ফকির আন্দোলন শুধু ইতিহাসের পাতায় ছিঁটে ফোঁটা দাগ কেটে ছিল তাই নয়। আধুনিক কথাসাহিত্যের উঠোনেও স্থান করে নিয়েছিল তা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস দুটি স্মরণ করলেই সহজে তা বোঝা যায়।

আনন্দমঠ (১৮৮২) :

আনন্দমঠ উপন্যাস-এর পটভূমি বাংলায় ঘটে যাওয়া ১৮৭২ সালের মর্মান্তিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে স্মরণ করায়। গ্রাম থেকে গ্রাম, পল্লীর আঁস্তাকুড় থেকে পাতার কুঠির, শ্মশান থেকে ভাগাড়, সর্বত্র মৃত নরকঙ্কালের স্তূপ। গাছের পাতা নেই, পুকুর-ডোবা-নালায় গেঁড়ি গুগলিও নেই। শুধু হাহাকার— অন্ন দে, অন্ন দে— অন্নদা। কিন্তু কোথাও নেই অন্ন। যেটুকু ছিল কোম্পানির লালমুখো সৈন্যরা তা হস্তগত করেছে। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অখণ্ড ভারতবর্ষের একশ্রেণির সন্ন্যাসী ও ফকিররা হাত গুটিয়ে বসে থাকল না। তারা হাজার হাজার বিঘা সূর্য হারা অরণ্যের মধ্যে আশ্রয় নিল। এরপর লুঠতরাজ চালিয়ে অস্ত্র ও সম্পদ সংগ্রহ করল। এরা ছিল পেশি শক্তিতে বলীয়ান। এই অর্থ লুঠ করতো কোম্পানির রাজস্ব থেকে আর দেশীয় জমিদারদের কাছ থেকে। কারণ এই দেশীয় জমিদারদের অধিকাংশই ছিল অর্থপিশাচ, নারীলোলুপ, স্বাজাত্যবোধহীন। আর ইংরেজ ছিল তো বিদেশি শত্রু। এই লুঠ করা সম্পদের অধিকাংশ তারা নিরন্ন মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। ১৭৭২ সালের এই ঐতিহাসিক বিষয়কে আশ্রয় করলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপহার দিলেন দুটি উপন্যাস, যা বাংলা কথাসাহিত্যে এবং তৎকালীন স্বদেশি আন্দোলনকারীদের কাছে মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল সন্দেহ নেই। বিশেষ করে আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম্' সংগীতটি বেদ মন্ত্রের মতো বিপ্লবীদের কণ্ঠে কণ্ঠে সে সময় উচ্চারিত হত।

উপন্যাসের চরিত্ররা সবাই প্রায় সন্ন্যাসী। এদের গুরু বা দলপতি হলেন সত্যানন্দ। মঠের অধ্যক্ষ। তিনি বৃদ্ধ। কিন্তু সবাই তাঁকে মান্য করেন। এই ছিল মঠের এবং সন্ন্যাস দলের নিয়ম ও রীতি। এদের মধ্যে ছিলেন ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ প্রমুখ। গৃহত্যাগী ও সন্ন্যাসী ছিল এঁরা সবাই। এদের মধ্যে নারীরাও ছিলেন; শান্তি ও কল্যাণী ছিল তাঁদের অন্যতম। কিন্তু সন্ন্যাসীরা ছিল নিরানন্দ। নারীর রূপ সৌন্দর্যের প্রতি দুর্বলতা ছিল এদের কাছে মহাপাপ। তাই সর্বদা তারা এ পাপ থেকে দূরে থাকতেন। মঠের সন্ন্যাসীরা ছিলেন গোঁসাই অর্থাৎ বৈষ্ণব। হাতে থাকতো গীতা। কণ্ঠে বেদমন্ত্র। কিন্তু এ সকল সন্ন্যাসীরা আবার মাতৃ আরাধনাও করতেন। অর্থাৎ বৈষ্ণব ও শাক্তের সমন্বয় ছিল এই মঠ ও মঠবাসীর প্রধান উদ্দেশ্য। দেবী চৌধুরানি উপন্যাসেও সেই সত্য আমরা লক্ষ করে থাকবো। গীতার ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ যেমন ছিল এদের কাছে সাধনার ও আরাধনার বিষয়, তেমনি মাতৃশক্তির ধ্বংসাত্মক রূপটি এদের কাছে জরুরি ও প্রাসঙ্গিক ছিল বলে মনে হয়। কারণ মা দুর্গা যেমন অশুভ শক্তির আধার অসুরকে বধ করেছিলেন। সেই একই মাতৃশক্তির নির্যাস নিজ নিজ বাহুতে ধারণ করাই ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ। অন্যথায় অশুভ শক্তিকে (দেশীয় অত্যাচারী জমিদার ও মুসলমান শাসক ও দুষ্টু ইংরেজ) ধ্বংস করা অসম্ভব। সেই আদর্শ সামনে রেখে এরা মঠের অধ্যক্ষের কাছে শিক্ষা নিতেন। সত্যানন্দ গীতার ভক্তিপদ সন্তান দলের অন্তরে সঞ্চার করতেন বা জাগরুক করতেন। যার ভিতর দিয়ে দেশ ও দেশবাসীর মধ্যে তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার দিকটি বর্ধিত হতে পারে। সেই সঙ্গে গীতার নিষ্কাম কর্ম অর্থাৎ আসক্তিহীন কর্মের অসাধারণ দার্শনিক সত্যটি সন্তান দলের হৃদয়ে জাগাতে ভুলতেন না। দলের প্রতি প্রবল আসক্তি যদি সর্বদা অন্তরে মাথা তুলতে থাকে তা হলে কর্মে নিষ্ঠা বিঘ্নিত হয়। কর্ম যথার্থ সাফল্য পায় না। সেজন্য সর্বাধ্যক্ষ সত্যানন্দ মঠের সন্তানদের কামনা-বাসনাহীন আসক্তিহীন ও শুদ্ধ ভক্তির প্রতি ব্রতী হতে প্রাণিত করতেন।

কিন্তু উপন্যাসের যত্রতত্র আমরা দেখি ভবানন্দ, জীবানন্দ নারীর সৌন্দর্য, সংসার অর্থাৎ জাগতিক আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। সেজন্য তারা মনে মনে দগ্ধ হয়েছে, এবং দেশ জননীর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে সংকল্প করেছে অন্তরে অন্তরে। প্রাণ বিসর্জন দিয়ে পাপ মুক্ত হতে চেয়েছে। তবে এটাও সত্য, এই সমাজ-সংসার-গৃহপরিবার-ভালোবাসা ভালোলাগা'র অনিবার্য আকর্ষণ সহজে কি ছিঁড়ে ফেলা যায়। না কি ছেঁড়া উচিত? এই বিশ্ব এই প্রকৃতি, প্রকৃতির সাজানো বৈচিত্র্যময় উদ্যানে আমরা তো ছোটো ছোটো কীটপতঙ্গের মতো, তাই যদি হয়

তাহলে কেমন করে সকল সামাজিক প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারি আমরা? যদিও বা হওয়া যায় তাহলে বিশ্ব প্রকৃতির ভারসাম্য কি বিঘ্নিত হবে না ? প্রশ্ন থেকে যায়— প্রশ্ন উঠে আসে চারিদিক থেকে।

যাইহোক, আনন্দমঠের শেষ প্রান্তে এসে আমরা দেখি ভবানন্দ, জীবানন্দ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। চারদিকে মৃতের স্তূপ! সেই রক্তাক্ত রণাঙ্গনে শান্তি তার প্রিয়তমকে খুঁজে ফিরেছে বুক ফাটা আর্তনাদে। জীবানন্দ ছিল তার স্বামী। অপরদিকে, বৃদ্ধ সত্যানন্দ সেই নির্জন রণভূমিতে এক দিব্যজ্যোতির্ময় মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছেন। সেই আলোকময় পুরুষ তাঁকে হিমালয়ের চিরন্তন শান্তির যোগ ভূমির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। উদ্দেশ্য— সেখানেই কৃষ্ণ আরাধনার মধ্য দিয়েই বাকি জীবন বাহিত করা। কৃষ্ণ প্রাপ্তি মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এতদিন দেশ ও দেশবাসীকে শৃঙ্খল মুক্ত করার ব্রত নিয়েছিলেন তিনি, সে সত্য বেশ খানিকটা হলেও সফল, এখন সব কিছুর মায়াবন্ধন ছিন্ন করে কৃষ্ণময় ভাবনাই হবে একমাত্র ভাবনা।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিম সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ইতিহাসকে নবরূপে লোক ও লোকায়ত আঙ্গিকে পাঠক ও দর্শকের কাছে তুলে ধরে বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ শুধুমাত্র বৃদ্ধি করেছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে বাঙালির কাছে একটা দার্শনিক ভাবনা রেখে গেছেন ধর্মপ্রাণ নৈষ্ঠিক বঙ্কিম হিসাবে। তাই এ উপন্যাস শুধুমাত্র ভারতের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ক্ষুদ্র ইতিহাসকে মাত্র জাগায়নি, সেই সঙ্গে মানবজীবনের মহাপ্রস্থানিক পথকে নির্দেশ করেছে।

দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) :

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমের আর একটি জনপ্রিয় উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী'। 'দেবী চৌধুরাণী' এক ঐতিহাসিক চরিত্র। অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলার ছোটখাটো জমিদার ছিলেন। দেশীয় শোষক জমিদার ও ইংরেজ শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে বাংলা ও দেশের মানুষকে মুক্ত করার মাঙ্গলিক ভাবনা প্রথম থেকেই দেবীর মধ্যে সংগুপ্ত ছিল। সেই ভাবনার বাস্তবায়নের পথে সক্রিয় সাহায্য পেয়েছিলেন পণ্ডিত ভবানী পাঠকের। ভবানী পাঠক ছিলেন একজন ডাকাত। তিনি ডাকাত হলেও ছিলেন পণ্ডিত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। আবার মাতৃশক্তির প্রতি ছিল তার আসক্তি। একদিকে গীতার শুদ্ধ ভক্তি, অপরদিকে মা ভবানীর মন্ত্রপুত খড়্গ বাহক। শোনা যায়, তিনি ছিলেন ভোজপুরী ব্রাহ্মণ। বিহারের গভীর অরণ্যভূমি ছিল তার আস্তানা। তার প্রধান সহকারী ছিল মজনু শাহ ফকির। এই দুই প্রতাপ ও

প্রভাবশালী দেশভক্ত মানুষের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা দেবীকে যারপরনাই দুর্ধর্ষ ও তীক্ষ্ণ করে তুলেছিল।

উপন্যাসের শুরু এবং শেষ পর্ব কিন্তু সামাজিক গ্রাম বাংলার পরিচিত পথ ধরেই রচিত হয়েছিল। দেবী 'চৌধুরাণী'— প্রফুল্ল নামে পল্লী বালিকা এবং বিবাহবন্ধনে এক জমিদার বাড়ির গৃহবধূর পরিচিতিও পেয়েছিলেন। কিন্তু জীবনের প্রাথমিক পর্বে বা সূচনায় এই সুখ সহ্য হয়নি। স্বামীর ঘর, জমিদার বাড়ির নববধূর রঙিন জীবন তার ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। এরপর এক মর্মান্তিক নাটকীয় ঘটনার প্রেক্ষিতে সে জঙ্গলের মধ্যে ছিটকে পড়ে এবং ভবানী পাঠকের সাক্ষাৎ পায়। এমন বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ খোলা তলোয়ারের মতো অথচ সত্যবাদী সদ্য যুবতী রমণীকে পেয়ে ভবানী পাঠক মুগ্ধ ও খুশি হলেন যারপরনাই। প্রফুল্লের কলঙ্কময় জীবনের যবনিকাপতন হল এখান থেকেই। সে ধীরে ধীরে ভবানীর তত্ত্বাবধানে দেবী চৌধুরানিতে উন্নীত হলেন। অচিরেই সারা বাংলার আকাশে-বাতাসে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল। সুনাম এবং ভয়ার্ত মিশ্রিত নাম। সুনাম— গরিবগুর্বোদের কাছে। অসহায় মানুষের কাছে যারা দেবী চৌধুরানির করুণা পায়। আর বিভীষিকা সেই সকল শাসকদের কাছে— যারা অর্থপিশাচ, প্রজাপীড়ক লুণ্ঠনকারী। এর মধ্যে দেশীয় কিছু জমিদার ও বণিক ইংরেজ ছিটেফোঁটা ইতিহাস, উপন্যাস ও কিছু কিংবদন্তী থেকে জানা যায় দেবী চৌধুরানি অধিকাংশ সময় নদীর বুকে বৃহৎ এক বজরায় অবস্থান করতো। সেই জলযানের মধ্যেই তার সকল সৈন্যবাহিনী থাকতো। নদীর এক শাখা থেকে অন্য শাখায় খুব দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যেতে পারত তার এই জলযান। শত্রুর উপর হঠাৎ আক্রমণ শানিয়ে; লুঠপাঠ-খুন-জখম যা করার তার সবটাই সম্পন্ন করে নদীর বুকে নিমেষে মিলিয়ে যেতেন। এমনই এক নারী বাংলার মাটিতে জন্মেছিলেন যখন বাংলার নারীরা বা নারীদের সিংহভাগ ঠিক নারী হয়ে ওঠেনি। সে জন্য দেবী চৌধুরানির জন্য আমরা খোলা মনে আজ গর্ববোধ করতে পারি। এর পাশাপাশি মেদিনীপুরের জেলার কর্ণগড়ের রানি শিরোমণিকেও আমরা স্মরণ করব। দুই বীরাঙ্গনা প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। দুজনের কর্মপদ্ধতি ও উদ্দেশ্য একই ছিল, তবে যোগাযোগ ছিল কিনা বলা শক্ত। ইতিহাসের পাতায় এই দুই বীরাঙ্গনার নাম ধূসর হয়ে যায়নি আজও।

যাইহোক শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রের কাছে ভবানী পাঠকের খড়্গ ও তলোয়ার খুব বেশি প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারেনি। পরাজিত ও শহিদ হলেন ভবানী। কিন্তু দেবী চৌধুরানি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন তার ইতিহাস আজও অস্পষ্ট। তবে উপন্যাসে আমরা দেখি স্বামী ব্রজেশ্বরের হাত ধরে স্বগৃহে

প্রত্যাবর্তন করেছেন। আসলে ঘর-সংসার, দাম্পত্য-বাৎসল্য ইত্যাদি মানব সমাজভুক্ত আকর্ষণগুলোর টানে বঙ্কিমের নায়ক-নায়িকারা বারবার ঘরমুখো হয়েছে। চন্দ্রশেখরের চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী, কিংবা 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্ল।

সহায়ক গ্রন্থ :

(এক) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(দুই) কালের প্রতিমা - অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
(তিন) বঙ্কিম মানস - অরবিন্দ পোদ্দার
(চার) বঙ্কিম সরণী - শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
(পাঁচ) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়